শাফিন রাশেদ এর ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

‘ফাহিমের একাত্তর’

(সপ্তম কিস্তি)

দশটা পনেরো তে মর্জিনা স্কুলের জন্য বের হল। তার সাথে আছে কুকুরটা। এটা এখন প্রতিদিনের হয়ে গেছে। টম প্রতিদিনই তার সঙ্গে যায়। টম সাথে আছে, এটা ভাবতে ওর শুধু ভালই লাগে, যাত্রাটা নিরাপদ মনে হয়। কারণ, সময়টা তো খারাপের খারাপ।

একশ গজ যাবার পর মর্জিনা বামে টার্ন নিলো। এই জায়গাটা খুব ভয় করে ওর। সুধীর কাকার বাড়িতে এখন রাজাকার ক্যাম্প। গেটে কেউ না কেউ থাকেই। লক্ষ্য রাখে কে যায় আর কে আসে।

আবু ভাইদের বাসার সামনে মর্জিনা । একশ গজ দুরে, হঠাৎ সামনে থেকে দুইটা ছেলেকে আসতে দেখে ও। ভয় পেয়ে গেল মর্জিনা। কারণ এর পরবর্তী দেড়শ গজের মধ্যে কোন বাসা নেই। ভরসা একটাই, টম আছে সঙ্গে।

ছেলে দু'টা কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, এই তোমাদের বাসা কোনটা ? মর্জিনা এই কথার কোন জবাব দিলো না। হাঁটতে লাগলো। শুধু আড় চোখে দেখল টমকে। টম তার দুই হাত পেছনে হাঁটছে।

-এই মেয়ে এই, কথা কানে যাচ্ছে না ? জিজ্ঞেস করলাম না, তোমাদের বাসা কোথায় ? ছেলে দু'টা হঠাৎ করে মর্জিনার ডান পাশে চলে এলো। মর্জিনা অস্বস্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। তাকাল টমের দিকে। মুখে বলল, ' টম'।

টম মুহূর্তে ঝাপ দিল কাছের ছেলেটার বুক বরাবর। মুখ দিয়ে নাভির নিচে প্যান্ট খামচে ধরল। বুকে ধাক্কা খেয়ে ছেলেটা রাস্তায় পড়ে গেল। টম বুকের ওপর পা রেখে মুখ বরাবর এগুলো। সাথের ছেলেটা উর্দুতে কি যেন বলতে বলতে দিল দৌড়। টম মুখ বরাবর কামড় দিতে লাগলো। হাত দিয়ে ঠেকাতে ঠেকাতে পড়ে যাওয়া ছেলেটা কোন মতে উঠে দাঁড়ালো।

মর্জিনা বলল, টম, টম, থাম। টম থামল না। ছেলেটার বাম হাত কামড়ে ধরে আছে টম। এবার ধমকে উঠলো মর্জিনা, টম, থাম বলছি।

টম ছেলেটাকে ছেড়ে দিল। ভো দৌড় দিল ছেলেটা। এত জোরে কাউকে আর দৌড়াতে দেখেনি মর্জিনা । ছেলেটা বড় রাস্তার গিয়ে বামে মিলিয়ে গেল। ঘুরে দাঁড়ালো মর্জিনা। এত কিছুর পর আর স্কুলে যেতে ইচ্ছা করছে না। তাছাড়া ছেলেটা বড় রাস্তায় আবার ঝামেলা করতে পারে।

মর্জিনা তাকিয়ে দেখল, টম বড় বড় শ্বাস নিচ্ছে। প্রচুর পরিশ্রমে টম এখন ক্লান্ত। টমের প্রতি কৃতজ্ঞতা চলে এলো। অনেক বড় বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে সে। এর আগে মর্জিনা এরকম কোন বিপদে পড়েনি।

ফাহিম ও ফিরোজ চরমপত্র শুনছিল। এমন সময় দরজায় টোকা পড়লো। সতর্কতার সাথে দরজা খুলল ফিরোজ। স্বপন । স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে স্বপনও ওদের সাথে যোগ দিল।

-সত্যি কি শহরে গেরিলা নেমেছে ? ফাহিম জানতে চাইল।

- হু-ম। সব শহরেই গেরিলা নেমেছে। ঢাকা শহরে বেশ কয়েকটি সফল অপারেশনও করেছে।

- তোরা বরিশালে করবি না ?

- প্ল্যান আছে। তবে এ নিয়ে আলাপ করতে মানা আছে।

ফাহিম জিজ্ঞেস করলো, দাদা, কাফনের কাপড় পাওয়ার পর ওদের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে ?

-ভাল প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। ওরা এখন সন্ধ্যার পর ঘর থেকে বের হয় না। পিচ কমিটির অনেকেই এখন রাতে বাসাতে ঘুমায় না।

-মানে, মনে ভয় ধরেছে।

এরপর ফাহিম শুনল টমের কাহিনী। সবাই এক চোট হাসল।

একটু পর ফাহিমের মা উঁকি দিলেন দরজায়। স্বপনকে বললেন, বাবা, খেয়ে যেতে ভুলো না কিন্তু।

প্রণাম করে স্বপন বলল, আচ্ছা মাসি, খেয়ে যাবো।

সকালে বাসা থেকে বেরিয়েই ডান দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলো মিল্টন। সাবিহা আপার বাসার দরজা পুরোপুরি খোলা। এত সকালে। বাসার মধ্যে মনে হচ্ছে কোন লোক-জন। কোন ঝামেলা না তো ? দৌড় দিয়ে গেল মিল্টন। গিয়ে দেখে মধ্য বয়স্ক এক লোক রুমের ভেতরে হাঁটাহাঁটি করছে।

-কে মিল্টন, আয়। আমার বাবা এসেছেন। তুমি যে চিঠিটা পোস্ট করেছিলে, বাবা সেই চিঠি পেয়েই চলে এসেছেন।

মিল্টন সাবিহা আপার বাবাকে সালাম করলো। বসলো পাশের চেয়ারে। ভদ্রলোকের নাম ওবায়দুল হক। হক চাচা অনেক গল্প করলেন। দিনাজপুরের গল্প। মিলিটারির গল্প। রাজাকারদের গল্প। মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প। তবে নিচু গলায়।

সাবিহা আর হক চাচার মধ্যে কথা হচ্ছিল। হক চাচা তাঁর মেয়েকে নিতে এসেছেন। মেয়ে গর্ভবতী। এই অবস্থায় একা থাকা ঠিক না। তবে মেয়ে যেতে নারাজ। সাবিহার ধারণা একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে, তার স্বামী এসে হাজির। খুব স্বাভাবিক ভাবে সাবিহাকে বলবে, অনেকদিন খিচুড়ি খাই না, খিচুড়ি বানাও তো।

শেষ পর্যন্ত হক সাহেব একাই যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। তবে এক মাস পর আবার আসবেন। তখন নিয়ে যাবেন মেয়েকে। তাঁকে তাড়াতাড়ি যেতে হবে, কারণ দিনাজপুরের বাসায় সাবিহার মা একা আছেন। যাবার আগে সাবিহার হাতে বেশ কিছু টাকা দিয়ে গেলেন হক সাহেব।

মনাদের বাসার সামনে অনেকগুলো রিক্সা। কী ব্যাপার ? কোন ঝামেলা না তো। এগিয়ে গেল ফাহিম। কথা বলল মনার বড় ভাই অণু। উনাদের ফাদার নাকি বলেছেন, সামনে অনেক ঝামেলা, হয়তো যুদ্ধও হতে পারে। তাই তারা গ্রামের বাড়ি চলে যাচ্ছেন। অযথা বিপদ নিতে চান না।

ছোট ছোট ব্যাগ রিক্সায় উঠানো হল। সবাই রিক্সায় উঠলো। সবাই ধীরে ধীরে নিরাপদে সরে যাচ্ছে। যে যেখানে পারে। অণু ভাই আরও বললেন, যাদের গ্রামে ঝামেলা, তারা প্রয়োজনে শহরের গির্জায় আশ্রয় নিতে পারে।

মন খারাপ হয়ে গেল ফাহিমের। সবাই নিরাপদে ছুটছে। কিন্তু তারা কই যাবে ? নদীতে গান বোট পাহারা দেয়। গুলি করে। চোর ডাকাতের উপদ্রব। মনে করেছিল, শহর নিরাপদ হবে। কিন্তু শহরেও ভীতি ছড়িয়ে পড়েছ। কি করবে ফাহিমরা ?

ফাহিম দেখল, সুধীর কাকাদের বাসা থেকে রাজাকারদের একটা দল বের হচ্ছে। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল। দুই লাইনে বিভক্ত হয়ে তারা যাচ্ছে। যাচ্ছে বগুড়া রোডের দিকে।

স্বয়ং সুধীর চক্রবর্তী এক সন্ধ্যায় আসলো ফাহিমদের বাসায়। ফাহিমের বাবা মজিদ সাহেব খুব অবাক হলেন। প্রণাম করলো সুধীর বাবু ।

সুধীর বাবু শুকিয়ে গেছেন। গায়ের রঙও ময়লা হয়ে গেছে। চেয়ারে বসতে বসতে মজিদ সাহেবকে বললেন, ভাইজান, আর ভাল লাগে না, পালিয়ে থাকতে। তাই চলে এলাম।

-আপনি কি মনে করেন না, আপনার কোন বিপদ হতে পারে ? উদ্বেগ নিয়ে জানতে চাইলেন ফাহিমের বাবা মজিদ সাহেব।

-আসলে কী আর করবো, কত দিন আর পালিয়ে পালিয়ে থাকা যায়। ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে সেদিন রব ভাইয়ের সাথে দেখা করেছি। উনি তো পিচ কমিটিতে আছেন। উনি বলেছেন, নিশ্চিন্তে বাসায় থাকতে। উনিই আসলে আমার দায়িত্ব নিয়েছেন।

-উনি যেহেতু দায়িত্ব নিয়েছেন, তবে তো আর কোন ঝামেলাই নেই। তবে বাসার উঠবেন কী ভাবে ? ওখানে তো রাজাকার থাকে।

-রব ভাই বলেছেন, উনি বাসা খালি করবার ব্যবস্থা নেবেন দু'একদিনের মধ্যেই।

-তবে তো খুবই ভাল কথা। আরতো কোন ঝামেলা নাই তা'হলে।

ফাহিম ভেতর থেকে লেবুর শরবত নিয়ে এলো। খেয়ে একটু বসলেন সুধীর কাকা। আসলে একটু বিশ্রাম নিলেন। তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালেন যাবার জন্য।

তিনদিন পর এক বিকেলে সুধীর কাকা তাঁর নিজের বাসার বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলেন। ফাহিমকে দেখে তিনি হাত ইশারায় ডাকলেন। বললেন, রোজ বিকালে এসে ভেতরের মাঠে খেলবে। তোমাদের অনুমতি দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে?

-ঠিক আছে কাকা । সুধীর কাকা পিরিচ বাড়িয়ে দিলেন বিস্কুট নিতে। ফাহিম পিরিচ থেকে একটা বিস্কুট তুলে নিলো।

স্কুল থেকে বাসায় ফিরে হোম-ওয়ার্ক করছিল ফাহিম। হঠাৎ মিল্টনের গলার স্বর। ফাহিম বাসায় আছো ?

-হু-ম। আসছি দাঁড়াও। ফাহিম বই-খাতা বন্ধ করে বাইরে গেল। দেখল, মিল্টনের সাথে ফাহিমদের কুকুর। ফাহিমকে দেখে টম ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো বেশি করে। ফাহিম দেখল, টমের পেট থেকে রক্ত বের হচ্ছে। দু পেটের দু'দিকে দু'টো দাগ- একটা ছোট একটা বড়। দু'টো থেকেই অল্প করে রক্ত ঝরছে।

-কী হয়েছে টমের ?

মিল্টন বলল, লক্ষণ কাকাদের বাসার রাজাকার ক্যাম্পের সামনে রাজাকাররা একটি অল্প বয়সী ছেলেকে ধরে নিয়ে এসেছে। ছেলেটাকে রাস্তায় মারতে মরতে নিচ্ছিল । সে চিৎকার করছিল। ওই চিৎকার শুনে টম ঘেউ ঘেউ করে উঠে। তখন ঠোঁটকাটা রাজাকারটা টমের গায়ে গুলি করে দেয়। একটি টমের গায়ে লাগে। আরেকটি লাগেনি।

বোধ হয় টম আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। বসে পড়লো ও ।এমন সময় ঘর থেকে ছুটে আসলো মর্জিনা । কান্না শুরু করে দেয় সে। বলে, ফাহিম একটা রিক্সা নিয়ে আয় তো।

-কেন ?

-টমকে পশু হাসপাতালে নিতে হবে। ওরা ছুটল রিক্সা আনতে।

মর্জিনা টমকে ঘরের বারান্দায় নিয়ে এলো। অল্প সময়ে পুরো বারান্দা রক্তে ভিজে গেল। ফিরোজ এক টুকরো কাপড় এনে টমের পেটে গুজে, আরেকটা দিয়ে পেট আড়াআড়ি করে বেঁধে দিল। যেন রক্ত পড়া কমে। কিন্তু কিছুই হল না। উপচে রক্ত গড়াতে লাগলো।

রিক্সার ফ্লোরে টমকে বসিয়ে মর্জিনা নিজেও উঠে পড়ল। আরেকটা রিক্সায় ফাহিম ও মিল্টন উঠল। মা মর্জিনাকে যেতে নিষেধ করলেন। কে শোনে কার কথা। মর্জিনা টমের মাথায় হাত দিয়ে আছে। বিলি কেটে দিচ্ছে চুলে। এমন আদরে টম সাধারণত গো গো আওয়াজ করে। এখনও করছে তবে শব্দ হচ্ছে না। মর্জিনার হাত টমের গলার কম্পন অনুভব করে।

বরিশাল পলিটেকনিক পেরিয়ে রিক্সা যখন পশু হাসপাতালে পৌঁছল , তখন সন্ধ্যা পাঁচটা বাজে। আরও আগেই হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। হাসপাতালে কেউ নেই। দারোয়ান পরের দিন আসতে বলল। কিন্তু পরের দিন পর্যন্ত কি বাঁচবে টম ?

রাত নয়টা বাজে। মর্জিনা পুরানো কাঁথা দিয়ে টমের জন্য বিছানা করে দিয়েছে। মাথা নিচু করে আছে টম। হয়তো উঁচু করে থাকতে পারছে না। কষ্ট হচ্ছে। এখন আর রক্ত বের হচ্ছে না। হয়তো শরীরে আর তেমন রক্ত অবশিষ্ট নেই।

দুরে হঠাৎ একটা বোমার শব্দ শোনা গেল। কয়েকটা গুলির শব্দও পাওয়া গেল। শব্দ শুনে মাথা তুলে দাঁড়ালো টম। হাঁটা শুরু করলো। কিন্তু কিছু দুর যাওয়ার পর পড়ে গেল টম। আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলো না।

মর্জিনা রক্ত লাগা কাপড় পরিবর্তন করে নতুন জামা পড়লো। ওযু করে নামাজে দাঁড়ালো। আল্লাহর কাছে টমের প্রাণ ভিক্ষা চাইলো সে। নামাজের মধ্যে বার বার তাঁর চোখ উপচে পানি ঝরতে লাগল।

রাত এগারোটার মত বাজে। টমের পাশে বারান্দায় বসে আছে ফিরোজ, ফাহিম ও মর্জিনা। টমের শ্বাসের গতি ধীর হয়ে এলো। বারান্দায় আলো হঠাৎ নিভে গেল। শুরু হল লোডশেডিং। হারিকেন আনা হল ।

আনুমানিক সাড়ে এগারটার দিকে টমের শ্বাস-প্রশ্বাস থেমে গেল। মর্জিনা দৌড়ে ভিতরে চলে গেল। ফাহিম হাত দিয়ে মুখ আড়াল করল। চোখের পানি কাউকে দেখাতে চায় না সে।

৯

অনেক দিন পর ফাহিমরা বাগানে একত্রিত হল।

লতা পাতায় ঘেরা রেইনট্রির শেকড়ে বসলো ফাহিম, মিল্টন ও বাদল। ওদের তিনজনকে বেশ উদ্বিগ্ন মনে হল। ফাহিম বলল, চল, ঠাকুর মাকে দেখে আসি। অনেক দিন যাওয়া হয় না ওদিকে।

মিল্টন খলিফা কাকার ভাড়াটে সাবিহা আপার কথা বলল সবাইকে। উনার খবরও নেওয়া দরকার। উনি অসুস্থ। উনার কত কিছুই না দরকার হতে পারে।

স্বপনদা নতুন একটা দায়িত্ব দিয়েছে ফহিমেকে। লক্ষণ কাকার বাসার রাজাকার ক্যাম্পের দিকে নজর রাখতে বলেছে। ওখানে নাকি যুবক ছেলেদের ধরে এনে টর্চার করা হয়।

-সেদিন রাতেও ওদিক থেকে চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। বলল বাদল। ওরা বাগান থেকে বের হয়ে গলির মাথায় গেল ঠাকুর মার খোঁজ নিতে। ওদের দেখে ঠাকুর মা হাসলেন। বললেন, কি রে, কই গেছিলি তোরা ?

-ক্যান কি হইছে ? জানতে চাইলো বাদল।

ঠাকুর মা বললেন, গতকাল রাজাকাররা আইছিল। স্বপন কই, কই গেছে, এসব জিগাইছে । ও নাকি যুদ্ধে গ্যাছে। জানতে চাইয়া গালি-গালাজ করছে। শিরিনগো বাসায়ও গেছিল। ওর ভাইও নাকি যুদ্ধ গ্যাছে ?

এমন সময় ঘরে ঢুকল শিরিন। শিরিন বলল সব। ওর ভাইও যুদ্ধে গেছে, এটা ভুল না। এখান থেকে গ্রামের বাড়ি গিয়েছে। ওখান থেকে ইন্ডিয়া। সবাই শুধু জানে গ্রামের বাড়ি গেছে। একমাত্র শিরিনকেই বলে গেছে । কিন্তু রাজাকাররা জানলো কী ভাবে ? কিছুতেই ভেবে পেল না শিরিন। ওর বাবা মা খুব ভয় পেয়ে গেছে। পারে তো এখনই গ্রামের বাড়ি চলে যায় । কিন্তু গ্রামে গিয়ে খাবে কি ? এ চিন্তাই তো সব পরিকল্পনা থামিয়ে দেয়।

স্কুল থেকে ফিরেই সাবিহা আপার বাসায় গেল মিল্টন। দরজায় নক করলো। দরজা খুলে দিল সাবিহা আপাই। কি খবর বল ? কেমন আছিস ?

-ভাল আছি আপা। লাগবে কিছু।

-কেন বলতো ?

-দোকানে যাচ্ছি। মামী সাবান আনতে পাঠিয়েছেন।

-ও । স্কুলে গিয়েছিলি আজ?

-হুম।

-শহরের অবস্থা কি?

-শান্তই তো মনে হয়। তবে রেডিও খুললে বোঝা যায় আসল অবস্থা কি ? সারা দেশে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। দেশ স্বাধীন হতে আর বেশি সময় লাগবে না।

-তাই নাকি?

-হুম। আচ্ছা আপা, দুলাভাই এর কোন খোঁজ খবর আছে ?

-না।

-উনার আব্বা আম্মারা জানেন উনার কথা?

-হু-ম।

-ও আচ্ছা। মিল্টন দেখল, হঠাৎ আপা গম্ভীর হয়ে গেল। দুলাভাইয়ের কথা তোলা উচিত হয়নি। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা দরকার।

-আচ্ছা আপা, বাবু কেমন আছে?

-কোন বাবু?

-যে বাবু আসছে দুনিয়ায়।

সাবিহা হঠাৎ একটু লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, মনে হয় ভাল আছে।

-আচ্ছা আপা, আপনি বুঝলেন কিভাবে ?

-থাক, তোকে আর পাকামো করতে হবে না। এই প্রসঙ্গ থাক। তুই দোকানে যাবি বলেছিলি না ? দোকানে যা। আমার চিনি শেষ হয়ে গেছে। চিনি আনতে হবে। আর চাল আনতে হবে। পাঁচ কেজি চাউল নিয়ে আসবি। পারবি না ?

-হ্যাঁ পারবো।

সাবিহা টাকা দিলো। টাকা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল মিল্টন। এমন সময় সাবিহা পেছন থেকে ডাকল, মিল্টন, দাঁড়া। সাবিহা মিল্টনের কপালে একটা চুমু এঁকে দিল। আজ থেকে তুই আমার একটা ছোট ভাই হয়ে থাকবি। বুঝলি? মিল্টন চলে গেল। খুশি হল মিল্টন। বুকের ভেতরে কেমন একটা ভালোলাগা বড় হতে লাগলো।

ঘুমচ্ছিল শিরিন। হঠাৎ ঘুমটা ভেঙে গেল। দেয়ালের দিকে তাকাল। দেয়াল ঘড়িতে রাত দু'টা উনিশ মিনিট বাজে। এত রাতে সাধারণত ঘুম ভাঙেনি শিরিনের। কী হল আজ ?

বাথরুমে গেল শিরিন। ফেরার সময় দেখে ছোট বোন আলো ঘুমাচ্ছে। কী মায়াবী মুখ। কী শান্ত চেহারা, অথচ কতই না অশান্ত চঞ্চল এই মেয়েটা। আম্মার রুমে বাল্ব জ্বলতে দেখে রুমে প্রবেশ করলো শিরিন। আম্মা চেয়ারে বসে শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে।

তোমার শ্বাস কষ্ট কি বেড়েছে আবার ?

-হুম। আয় ভেতরে আয়। মায়ের রুমে প্রবেশ করে শিরিন, পাশে বসলো। শিরিন দেখল, আব্বু ঘুমাচেছন। শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে হালকা নাক ডাকছেন । আম্মাকে বলল, তোমার কি কষ্ট হচ্ছে?

-হুম। মাঝে মাঝে এমন হয়। সমস্যা হচ্ছে, এমনটা হলে রাতে ঘুম হয়না। তুই যা। ঠিক হয়ে যাবে এক সময়।

-ওষুধ খেয়েছ?

-হ, খাইছি।

কিছুক্ষণ বসার পর নিজের রুমে আসলো শিরিন। কয়েক বছর যাবত এ রোগটা ভোগাচ্ছে মাকে। ডাক্তার দেখানো হয়েছে। অ্যাজমা না কি যেন বলে। শীতের সময় তো আরও বেশী কষ্ট হয়।

শিরিন খেয়াল করে, তার মা ইদানীং অনেক বেশি চুপচাপ হয়ে গেছেন। বিশেষ করে আসগর ভাই চলে যাবার পর থেকে। মা যুদ্ধ নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন। শিরিনকে জিজ্ঞেস করে যুদ্ধের কথা। এ কারণে যুদ্ধ সম্পর্কে খোজ রাখতে হয় শিরিনকে। শিরিন বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে লাগলো।

হঠাৎ মনে পড়লো স্বপনদার কথা। ইদানীং এটা হচ্ছে খুব। ও বুঝতে পারে, স্বপনদার কথা ভাবতে ভাল লাগে ওর। শিরিন যখন প্রথম জানলো স্বপনদাও একজন মুক্তিযোদ্ধা, তখন থেকে এই ভালোলাগাটা শুরু হয়। নিজের মধ্যে কেমন যেন পরিবর্তনটা লক্ষ্য করে। মনে পড়ে, স্বপনদা যখন প্রথম শিরিনদের বাসায় এসে বললেন, উনার ঠাকুরমার দিকে একটু লক্ষ্য রাখার কথা। শিরিন বলেছিল, আপনি চিন্তা করবেন না। আমি নিয়মিত উনার খোঁজ-খবর নেব। সবপনদা আর কথা বাড়ান নি। চলে গিয়েছেন।

ভাবতে ভাবতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল শিরিন। হঠাৎ শুনল একটা চিৎকার। আরও একটা চিৎকার। তন্দ্রা চলে গেলো পুরোপুরি। নারী কণ্ঠের চিৎকার যেন। স্বপনদার বাসার ওদিক থেকেই আসছে মনে হয়।

শিরিন উঠে বসলো। বেশ হইচই শোনা যাচ্ছে। জানালা খুলে স্বপনদার বাসার দিকে তাকালো শিরিন। সে এখন কি করবে ? বাবাকে ডাকবে ? বাবাই বা কী করবে এত রাতে, একা ? জানালা দিয়ে তাকাল বাইরে। কয়েক জন লোক স্বপনদাদের বাসা থেকে বের হচ্ছে। ওদের একজনকে

চিনল। ঠোঁট কাটা সেই রাজাকারটা। সে খোলা জানালার দিকে তাকাল। তাড়াতাড়ি জানালা বন্ধ করে দিলো শিরিন। ভয়ে কাঁপছে সে। ঘড়িতে এখন সোয়া পাঁচটা বাজে। ভোর হতে শুরু করেছে কিছু আগেই।

খুব সকাল থেকে লোকজনের ভিড় বাড়তে থাকে স্বপনদের বাসায়। বিছানায় পড়ে আছে ঠাকুর মা'র নিথর দেহ। চোখ খোলা, বড় হয়ে আছে যেন। জিহ্বাটা একটু বের হয়ে আছে। গলায় কালচে দাগ। দশটার দিকে আসলো পুলিশের গাড়ি। লাশ নিয়ে গেল। পোস্ট মর্টেম করা হবে। অস্বাভাবিক মৃত্যু, তাই।

তিনদিন পর শিরিনদের বাসায় এলো স্বপন। শিরিন চা নাস্তা দিল। কিছুই খেলেন না স্বপন। শিরিন বলল সেই রাতের কথা। ঠোঁটকাটা সেই রাজাকারটার কথা।

ফাহিম সাধারণত চৈতন্য স্কুলের মধ্য দিয়ে বাসায় ফিরে। সেদিন কী মনে করে চ্যাটার্জি লেন যেখানে বগুড়া রোড থেকে শুরু, সেখান থেকে আসতে লাগলো। গলির ভেতরে একটি গাড়ি আসতে দেখল। গাড়িতে খাকি পোশাক পড়া পাঁচ-ছয় জন বাঙালি লোক বসা। গাড়িটা সুধীর উকিল কাকার বাসার সামনে থামল একটু। তারপর আবার চলতে শুরু করলো। বিশ গজ দুরে গিয়ে আবার থামল। খলিফা কাকার বাসার দিকের রাস্তায় নামলো এবং এগুতে লাগল সামনে। সবাই বাংলায় কথা বলছে, শুধু একজন এর মধ্যে উর্দুতে কথা বলছে। ফাহিম নিজেদের বাসার দিকে এগুলো এরপর।

দুই দিন পরের কথা। খুব সকালে মজিদ সাহেব ফাহিমকে ডেকে তুলল। পাঁচটা বাজতে আরও কিছু সময় বাকি আছে। ঘুম থেকে উঠে ফাহিম পুকুরের পানিতে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে আসলো। আসার সময় দেখল সুধীর কাকার বাসার সামনে কয়েকটা গাড়ি। ফাহিম কিছুই বুঝতে পারলো না। তবে অনুমান করলো, যাই হোক, ভাল কিছু হবে না।

এদিকে মজিদ সাহেব হাত মুখ ধোয়া শেষ করে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামাজ শেষ করে কুরআন তেলাওয়াত শুরু করলেন। সুরা আর রাহমান। কুরআন তেলাওয়াত শুনতে শুনতে ফাহিম জামা কাপড় পাল্টাতে লাগলো। আব্বুর সঙ্গে যেতে হবে মর্নিং ওয়াকে।

বাসা থেকে বের হয়ে ওরা সুধীর বাবুর বাসার সামনে কাউকে পেল না। তবুও বাবা মজিদ সাহেবকে বলল ব্যাপারটা ফাহিম। মজিদ সাহেব কোন গুরুত্বই দিলেন না। কোথায় না কোথায় কী দেখেছে, বাচ্চা মানুষ।

ফাহিমরা কালীবাড়ি হয়ে সদর রোডে এসে পড়ল। সেখানে একটি দোকানে বসে চা খেল বাপ বেটা। আবার রওনা দিলো বাসার দিকে। রাস্তায় হাবিব কাকা থামল মজিদ সাহেবকে।

-শুনেছেন, ব্যাপারটা। সুধীর বাবুকে ধরে নিয়ে গেছে ।

-তাই নাকি ?] কারা নিলো, কখন ?

-ভোরের দিকে। মিলিটারির গাড়ি এসেছিল। সাথে রাজাকাররা।

কথা আর এগুলো না। যে যার বাসার দিকে রওনা দিল।

সকালে যখন ফাহিম স্কুলে যায়, দেখে সুধীর কাকার বাসার সদর দরজাটা খোলা। একেবারে খোলা। ভেতর পর্যন্ত দেখা যায়। যেন পরিত্যক্ত বাড়ি একটা ।

রাত ন'টা। খাবার টেবিলে বসে আছে ফাহিম, মজিদ সাহেব ও ফাতেমা বেগম। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ করেছেন মজিদ সাহেব। খুব অল্পই খেয়েছেন তিনি। তাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

-আপনার কি শরীর খারাপ নাকি ? ফাতেমা বেগম জানতে চাইলেন।

-না, শরীর ঠিক আছে । তবে মন খারাপ। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন মজিদ সাহেব।

-কেন, বলেন তো ?

-চতুর্দিকে হাজার হাজার নিরীহ মানুষ মারা হচ্ছে, অথচ এই জালেমরা এখনো বুঝতে পারছে না এভাবে পাকিস্তান রক্ষা হবে না। বাঙালিরা ওদের অত্যাচারের প্রতিরোধে সংঘবদ্ধ হয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে । দেশটা যে ওদের দোষে ও গোঁয়ার্তুমিতে ভেঙ্গে যাচ্ছে, এটা ওরা এখনো বুঝতে পারছে না। শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দিলে কী এমন ক্ষতি হত ওদের ? কিচ্ছু হত না, দেশটাও রক্ষা পেত। অথচ এই পাকিস্তান নিয়ে একসময় মানুষের কত স্বপ্ন ছিল, কত আকাঙ্ক্ষা ছিল। জালিমদের হাতে আজ সব শেষ।

-দেখেন, এগুলো বলে এখন লাভ নাই। জল অনেক গড়িয়ে গেছে। রক্ত অনেক গড়িয়ে গেছে।

-হ্যাঁ, তা ঠিক। আবার দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মজিদ সাহেব।

বিএম স্কুলের মাঠে ফুটবল খেলছিল ফাহিমরা । বিরাট মাঠ। ওরা খেলছিল রব উকিল সাহেবের বাসার দিকটাতে। যেন বোঝা যায়, বাসায় কারা ঢুকল আর কারা বের হল।

স্বপনদা ফাহিমকে বলেছে, আজ এদিকে সে আসবে। ওদের সাথে কথা বলবে। কী বলবে, কে জানে ? সন্ধ্যা হয়ে আসছে। খেলা শেষ করে ওরা মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বসলো। এখান থেকে মহল্লার বাগানটা কাছে। আবার স্কুলের সামনের রাস্তা ধরে একটু এগুতেই নতুন বাজার রোড। এটা পেরিয়ে উল্টা দিকে গেলে শহরতলীর রাস্তা। সামনেই গ্রাম শুরু। ওরা শুনেছে, মুক্তিযোদ্ধারা নাকি অ্যাকশন শেষ করে এ রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যায়।

মিল্টন বাদলকে বলল, দোস্ত, তোরা থাক। আমার মামা বলেছে, সন্ধ্যার আগে যেন বাসায় ফিরি।

-আরে দাঁড়া, আর পাঁচ মিনিট দেখি। এর মধ্যে না এলে আমরাও চলে যাবো।

-ফাহিমরা যেখানে দাঁড়িয়েছে, তার পাশেই টুলটিদের বাসা। বাসার পাশের অন্ধকার থেকে বের হল স্বপন। ফাহিম আস্তে করে সবাই কে বলল, বাম দিকে তাকা। সবাই তাকাল। স্বপন আসছে। পিঠে একটা ব্যাগ। বড় ব্যাগ। ব্যাগে মনে হয় ভারি কিছু আছে।

স্বপন চারিদিকে তাকাল। এরপর ব্যাগটা আস্তে করে মাটিতে রাখল। ফাহিম জিজ্ঞেস করলো, দাদা কী এতে ?

স্বপন ছোট করে বলল, এতে অস্ত্র আছে। রাইফেলের মত। তবে আকারে ছোট । ফাহিম উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, অ্যাকশন হবে নাকি আজ ?

স্বপন এড়িয়ে গেল কথাটা। যেন কিছুই শোনেনি। শুধু চারিদিকে তাকিয়ে বলল, শোন, এখন খুব খারাপ সময় যাচ্ছে। চারিদিকের অবস্থা খুবই খারাপ। শহরে বেশকিছু মুক্তিযোদ্ধা ঢুঁকে গেছে।

চোরাগোপ্তা হামলা হচ্ছে। আমাদের প্রাথমিক টার্গেট হচ্ছে রাজাকারদের ক্যাম্পগুলো। এ মহল্লায় বেশ কিছু রাজাকার ক্যাম্প আছে।

-ওরা কি জানে এসব ?

-হ্যাঁ, ওরা বুঝতে পেরেছে। এ কারণে ওরা এখন মরিয়া হয়ে উঠেছে। যাকে তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেছে। এমনকি মেয়েদেরও রেহাই দিচ্ছে না।

-আমরা কি কিছু করতে পারি ?

-তোমরা লক্ষণ কাকার বাসার ক্যাম্পের দিকে নজর রাখবে। নজর রাখবে রব উকিলের বাসাতে। শিরিনদের বাসার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। আমার ধারণা, ওদের বাসাতেও হামলা হতে পারে।

-কেন?

-ওরা মনে করতে পারে, এ বাসার কেউ ঠাকুরমাকে হত্যা করাটা দেখেছে।

-তাহলে তো শিরিন আপাদের বাসা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবার কথা বলা উচিত।

-দেখি কি করা যায়। আমি যাবো আজ শিরিনদের বাসায়।

এমন সময় স্কুলের ওপাশে দুইটা ছেলেকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। স্বপনদা ছেলে দু'জনকে কাছে ডাকল আর মিল্টনদের উদ্দেশ্যে বলল, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে আগামী বুধবার। এই সময়। এই স্থানে। বাদলরা দেখল স্কুলের ওপাশে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে স্বপনদারা। প্রত্যেকের কাঁধেই ব্যাগ। হয়তো আজ কোন অপারেশন আছে।

(চলবে...)

শাফিন রাশেদ : লেখক ও চিকিৎসক